শ্রদ্ধার্ঘ্য

নূরজাহান মুর্শিদ

নারীপক্ষ

র‍্যাংগস নীলু স্কয়ার (৫ম তলা)
সড়ক- ৫/এ, বড়ি- ৭৫
সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
ফোন : ০৮৮ ০২ ৪৮১১১১৭৩ ০৮৮ ০২ ৫৮১৫৩৯৬৭
মুঠোফোন: ০১৮১৯২৪০০৬৮
জি.পি.ও বক্স-৭২৩
ই-মেইল: naripokkho@gmail.com
ওয়েব সাইট: www.naripokkho.org.bd

নূরজাহান মুর্শিদ

ভূমিকাঃ

২২মে, ১৯২৪ মুর্শিদাবাদের তারানগরে বেগ পরিবারে নূরজাহান বেগ এর জন্ম। তাঁর মা খতিমুন নেসা এবং বাবা আইয়ূব হোসেন বেগ। বাবা ছিলেন ব্রিটিশ পুলিশ সার্ভিসের মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলার পুলিশ প্রধান। মা গৃহব্যবস্থাপক। সাত বোনের মধ্যে তিনি চতুর্থ।

১৯৪৮ সালে খান সারওয়ার মুর্শিদের সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের দুই ছেলে খান আহমেদ সায়ীদ মুর্শিদ ও খান আহমেদ নুআয়ীদ মুর্শিদ এবং দুই মেয়ে তাজীন মাহনাজ মুর্শিদ ও শারমীন সোনিয়া মুর্শিদ।

নূরজাহান মূর্শিদ ছিলেন একজন শিক্ষক, একজন সাংবাদিক। অল ইন্ডিয়া রেডিওতে ঘোষিকা হিসাবে কাজ করেছেন তিনি। ১৯৫০ এর গোড়ার দিকে তিনি রাজনীতিতে যুক্ত হন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং পূর্ববাংলার আইন পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে আইন পরিষদ সচিব (পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি) হিসাবে কাজ করেন।

১৯৭১ এ মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে ভারতীয় লোকসভার যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার আহবান জানানোর দায়ে পাকিস্তানের সামরিকজান্তা তাঁকে ১৪ বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করে। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি বাংলাদেশ মহিলা সমিতির প্রথম সভাপতি ছিলেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন আজিমপুর লেডিস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং বারডেমের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

সমাজসেবায় অবদানের জন্য তাঁকে ২০১৩ সালে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়।

নারীপক্ষ থেকে ২০০৩ সালের জুলাই মাসে শিরীন হক এবং নিয়াজ জামান কয়েক দফায় নূরজাহান মুর্শিদ এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। সাক্ষাৎকারটির সংকলন ও সম্পাদনার কাল জুলাই ২০২১, এ কাজটি সম্পন্ন করেছেন নাজমুন নাহার শেলী, তৎকালীন প্রচার সম্পাদক, নারীপক্ষ। নূরজাহান মুর্শিদ এর বলা কথাগুলো তাঁর ভাষ্যে লিখিত আকারে প্রকাশ করা হয়েছে এমন একজন শিক্ষক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিপ্রিয়, রাজনীতিবিদ নারীর কথা জেনে নতুন প্রজন্মের নারীরা উৎসাহিত হবে এ প্রত্যাশায়।

উল্লেখ্য যে, সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজটি সম্পূর্ণ করতে আরোও একদিন তাঁর সাথে বসার কথা ছিলো। কিন্তু ইতিমধ্যে ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এক তারিখ তিনি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন।

শুরুতেই তিনি তাঁর শৈশব ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় জানালেনঃ

ছোটবেলার কথা বলতে গেলে আমার বাবা পুলিশ অফিসার ছিলেন। আমাকে অনেক জায়গায় অনেক জেলায় জেলায় ঘুরতে হয়েছে। আমার বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার একটা স্মৃতি আছে, তলপিতলপা গুটিয়ে যাওয়া খুব মন খারাপ লাগতো। হয়ত ৪/৫ বছর এক জায়গায় কাটালাম তারপর আবার ছেড়ে যাওয়া ছোটবেলার সেসব স্মৃতিগুলো মনে পড়ে। বন্ধুবান্ধব হতো তাদেরকে ছেড়ে চলে যেতাম অন্য জায়গায়। এক জেলা থেকে অন্য জেলায়।

ছোটবেলার তো অনেক রকমের স্মৃতি। বাবা মার মারধোর, তারপর লেখাপড়া না করার অভিযোগ আছে। তবে আমাদের সময়ে স্কুল খুব কম ছিল। হাই স্কুল কম ছিল এবং যাতায়াতেরও খুব অসুবিধা ছিল। সে জন্য যখন আমার ১২ বছর বয়স তখন বাবা আমাকে আমার চাচা ছিলেন মনিরুজ্জামান হোসেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি ছিলেন বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের প্রফেসর। আরবী এবং ফারসী পড়াতেন। তো ওখানে বরিশালে সদর গার্লস স্কুলে প্রথম ভর্তি হলাম ক্লাস সিক্স-এ। এর আগে পর্যন্ত বাড়ীতে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়েছি। তখনতো এত ভালো স্কুল ছিল না। বাবা যেমন তেমন স্কুলে দিতে চাইতেন না বলে গৃহশিক্ষক রাখতেন। তাঁদের কাছে নিয়মিত পড়াশোনা হতো। যে কারণে ক্লাস সিক্স-এ গিয়ে ভর্তি হলাম। আমার চাচা তো বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের প্রফেসর উনাদের ছুটি হতো গরমের ছুটি এবং পুজোর ছুটি। গরমের ছুটি ২ মাস এবং পুজোর ছুটি ১ মাস। বাবা দেখলেন যে, যে কোন স্কুলের ছুটি ১ মাস, আর কলেজের ছুটি ৩ মাস। তো আমার মেয়ের দু'মাসের পড়া কামাই হচ্ছে। তখন উনি ভাবলেন যে, না চাচার কাছে রেখেতো পড়াশোনা করানো যাবে না। তখন আমাকে কলকাতায় খোঁজ খবর করে তখন দুটো তিনটে কলেজ ছিল, তো বাবা আমাকে ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনে দিলেন। ওখানে উনার আগে থেকে আলাপ ছিল। ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন প্রথমত স্কুল ছিল তারপরে আবার কলেজ হলো।

আমি স্কুলে ভর্তি হলাম। আমি ওখানে গিয়ে ক্লাস এইট-এ ভর্তি হলাম। চাচার কাছে যখন গেলাম বরিশাল সদর গালর্স হাইস্কুলে, আমি ক্লাস সিক্স-এ ভর্তি হয়েছিলাম। ক্লাস সিক্স-এ ২ বছর ওখানে থাকলাম। এইট-এ উঠে বাবা আমাকে নিয়ে আসলেন কলকাতায়। কলকাতায় এনে ওখানে ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনে ভর্তি করলেন। তখন প্রিন্সিপাল ছিলেন লিলা রায় এবং ছিলেন হিমন্তীদি আমরা বেবীদি ডাকতাম। বেবীদি ছিলেন বিরাট লম্বা, বড় বড় চোখ। দেখে ভাল লাগতো। দুইজনেই আমাকে পরীক্ষা করলেন প্রিন্সিপাল এবং সুপারিন্টেন্ডেন্ট। তারপর আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিলেন জায়গা টায়গা সব। প্রথম প্রথম খুব মন খারাপ লাগতো। তারপর অচিরেই দেখি যে বন্ধুবান্ধব হয়ে গেল। তখনতো সেখানে হোষ্টেল এবং কলেজ একত্রেই ছিল। ওখানে আমাদের প্রিন্সিপাল লিলাদি, তিনিও সেখানে থাকতেন। তাঁর একটা কোয়ার্টার ছিল। একই কম্পাউন্ডে সব। তিনি আবার খেলাধুলা খুব ভালবাসতেন। তিনি চাইতেন আমরা, বিশেষ করে যারা হোষ্টেলে থাকি প্রতিদিন বিকেলে আমারা যেন মাঠে খেলাধুলা করি। আমাদের খেলাধুলার ব্যবস্থাটা তিনি আলাদা নিয়ম করে করাতেন এবং মাঝে মাঝে তিনি এসে দেখতেন। আমাদের খেলাধুলার মধ্যে ছিল বাস্কেট বল আর ব্যাডমিন্টন আর একটা ভলিবল জাতীয়। বাস্কেট বল খেলাতো আমার খুব প্রিয় খেলা ছিল। আমাদের আন্তর্জাতিক স্কুল কলেজের সাথে প্রতিযোগীতা হতো। তখন গড়ের মাঠে গিয়ে আমাদের টেষ্ট হতো। আবার ফাইনাল শো' হতো। তখন উঠতে হতো ভোর ৫টায়। শীতকালে বিশেষ করে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে উঠতাম। তবুও উঠতে হতো খেলার আমার নেশা ছিল। আবার ডিফেন্সের লিনাদি তিনিও আমাদের সাথে উঠে

যেতেন। মিঃ পল বলে একজন ছিলেন, তিনি আমাদের তালিম দিতেন খেলাধুলায়। আমাদের প্রিন্সিপাল, তিনি আসতেন গড়ের মাঠে আমরা সব হৈ চৈ করে দৌড়াদৌড়ি করে খেলে টেলে ওখানে নাস্তা কমলালেবু আর মিষ্টি বসে বসে খেতাম। খেয়ে দেয়ে আবার ফিরে আসতাম। তো আমার ইনষ্টিটিউশনের খেলাধুলার যে পরিবেশটা খুব ভাল লাগতো। যেহেতু টিচাররাও ইনভল্ব থাকতেন। তারা উৎসাহ দিতেন এবং মেয়েরাও ধরো যে শোভাদি, শোভা ঘোষ তিনিও খেলাধুলা করতেন। তিনি আমার দুই বছরের সিনিয়র। তাঁর ব্যাট করা ভাল লাগতো। এই ছিল আমার ছোট বেলার স্মৃতি। তবে খেলাধুলার পরিবেশটা; পড়াশোনার পরিবেশ সবারই থাকে, কিন্তু খেলাধুলার পরিবেশটা সবখানে পাওয়া যায় না ! সেটাই আমাদের প্রিন্সিপাল দিয়েছিলেন। সে জন্য আমরা একটু ভাল বোধ করতাম নিজেদেরকে।

লাইট অফ করা একটু কড়াকড়ি ছিল হোষ্টেলে। আর আমাদের ঘুমাতে যাওয়ার সময় ছিল ৯.০০টা থেকে ৯.৩০-এর মধ্যে। অল দ্যা লাইট উড বি অফ। কিন্তু যখন কলেজে উঠলাম তখন সময় ছিল ১০.০০টা। পরীক্ষার আগেও কোন রকমে আধ ঘন্টা বেশী পড়তে পারতাম। ঐ আগে একটা ওয়ার্নিং বেল পড়ত। তখন ঘুমাতে যাওয়া বুঝাত। তারপর সব শুয়ে পড়লে আমাদের বেবীদি একবার করে টহল দিয়ে যেতেন। সব শুয়েছে কিনা, সবাই বিছানায় আছে কিনা ঘুরে ঘুরে গিয়ে দেখতেন। আমরা চোখ বন্ধ করে থাকতাম, তারপর চলে যেতেন। একদিন পরীক্ষার আগে আমাকে আমার এক বন্ধু বলল চল আমাদের যে ড্রইংরুম আছে বক্স রুম চারিদিক বন্ধ করলে একেবারে অন্ধকার, ঐ ঘরে একটা বাতি জ্বালিয়ে আমাকে একটা অর্থ বুঝিয়ে দিবি। তারপর দরজা বন্ধ করে ওকে বুঝাচ্ছি এমন সময় দরজার খট খট আওয়াজ। দরজা খুলে দেখি বেবীদি দাঁড়িয়ে আছেন। ''যাও যাও শুয়ে পড়। কালকে মাথা ঘুরলে পরীক্ষা দিবে কেমন করে।'' তো খুব কড়াকড়ি নিয়ম ছিল। আবার ঐ সেবাযত্নও ছিল ভাল। অসুখে বিসুখে এটাতে সেটাতে খুব দেখাশুনা করতেন। আমাদের ছোট বেলাকার স্কুল কলেজের স্মৃতি খুব পুরোনো এবং খুব ভাল ছিল মনে হয়, আনন্দের ছিল। আজকাল যখন দেখি কোন স্কুলে খেলাধুলা হয় তখন আমার কাছে মজা-ই লাগে। আমাদের সেই সকালে অন্ধকার ভোর ৫টায় সেই গড়ের মাঠে নিয়ে যেতেন। সেই শীতের মধ্যে ঠকঠক কাঁপতে কাঁপতে তারপর আমরা সেখানে গিয়ে প্র্যাকটিস করতাম। ততক্ষণ বেবীদি বসে থাকতেন। তারপর আমাদের নিয়ে আসতেন। ফিরে এসে তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে পরিস্কার হয়ে নিয়ে খেয়ে টেয়ে তারপরে ক্লাশ-এ যেতাম।

আমাদের সময় ম্যাট্রিক বলা হতো। ভিক্টেরিয়া ইনষ্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক পাশ করলাম তারপর ওখানে কলেজ খোলা হলো। আই.এ পড়লাম। বি.এ ক্লাশ খোলা হলো। ঐখানে পড়লাম। যখন এম.এ তে ভর্তি হলাম তখন ভিক্টেরিয়া ইনষ্টিটিউশন ছাড়লাম। ছেড়ে আসলাম যখন ইন দ্যা মিন টাইম পাকিস্তান হয়েছে সব ভাগ হয়েছে। মুন্নুজান হল হয়েছে।

তখন একটা ব্যাপার হতো মেয়েদের হোষ্টেলতো বাইরে থেকে ঢিল মারতো, চিঠি পাঠাতো। কলেজে যখন উঠলাম তখন আমরা এদিক থেকে ওদিকে গেলাম আর একটা হলে। সেই হলের বারান্দাটা ছিল বড় রাস্তার উপর। ট্রাম লাইনের উপরে প্রায় বলতে গেলে। তো আমরা ওদিকে দরজা দিয়ে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতাম। মাঝে মাঝে বাতি জ্বলে ঘরে আর সারাদিন অন্ধকার থাকে। সব আমরা বাইরে থাকি। আমরা রাত্রে যখন খাওয়া দাওয়ার পড়ে এসে দরজা খুলি তখন টুকটুক করে ইট পাটকেল একটু আধটু পড়তো ওখানে। ভয় পেয়ে যেতাম। কারা এরকম বিরক্ত করে! তারপর গেলাম নালিশ করতে টিচারের কাছে। এরকম করলে আমাদের খারাপ লাগে! আমরা চমকে যাই! বিভূতি বলে একজন আছে আমাদের দেখাশুনা করত। তখন গিয়ে বললাম, বিভূতি এরকম ব্যাপার এরকম ঢিল পড়ে নানা রকম চিঠি লিখে সেগুলো ভারী ইট দিয়ে পাঠায়।

তখন সে বলে কি, এককাজ কর তোরা চিঠি লিখে দে একটা সিকা ঝুলিয়ে দে। আর লিখে দে ''যাহা কিছু দেবার ইহাতে দিবেন আমরা উঠাইয়া লইব"। কষ্ট করে ঢিল ফেলতে হবে না। হা হা হা....!

আমার শিক্ষা জীবন পুরাটাই হোষ্টেলে কেটেছে। কয় বছর ছিলাম, দুই বছর ক্লাশ সিক্স, ক্লাশ এইট ভর্তি হলাম কলকাতায় তারপর ওখানে ৪বছর ৫বছর গেল। তারপর আই.এ দুই বছর, বি.এ দুই বছর। ওটা ছিল ১৯৪৩ সাল আমি বি.এ শেষ করলাম। পাকিস্তান আন্দোলন হয়নি তখন। যখন আমরা এম.এ তে পড়ি তখন শুরু হলো। এম.এ তে ভর্তি হলাম ইউনিভার্সিটিতে। কলকাতা ইউনিভার্সিটি।

আমার সাবজেক্ট ছিল ইসলামিক হিষ্ট্রি এ্যান্ড কালচার। আমার ইচ্ছা ছিল না, তখন নতুন সাবজেক্ট সবাই উৎসাহ দিল টিচাররাও। মাত্র কয়েকজন ৩/৪ জন ছাত্রী। শিক্ষকরা বলে যে এটা নাও, নিলাম। কিন্তু আমার তো আরবী ফারসী জানা ছিল না। আরবী পড়তে পারি কিন্তু অর্থটর্থ বুঝেতে কখনও পড়িনি। না পাড়লে অসুবিধা হবে না। কয়েকজন টিচার ছিল আলাদা করে পড়িয়ে দিয়েছে। অল্প স্বল্প ছাত্র ছাত্রী, নতুন সাবজেক্ট বলে সবাই উৎসাহ দিয়ে ওখানে ঢুকালো । তো ওটা পড়লাম পড়ে ওখান থেকে পাশ করলাম। এম.এ পাশ করলাম ১৯৪৬-এ।

ইতিমধ্যে আব্বা মারা গেছেন ১৯৪৫-এ। পার্টিশনের আগে। আম্মা থাকতেন মুর্শিদাবাদে আমাদের দেশের বাড়ীতে ভহরামপুরে। আমরাতো ৭ বোন। ছোট বোনরা ছিল ওখানে। আমার বড় বোন আরও ৩ জন। আর ওখানে দেশের বাড়ীতে দাদী, চাচা সবাই ওখানে। সেদিক দিয়ে কোন অসুবিধা ছিল না। তারপরতো দেশ ভাগ হলো। তখন আমার মামা চলে এলেন দেশ ছেড়ে। বাড়ী ছেড়ে তখন রাজশাহী আসলেন হাসনাবাদ থেকে রাজশাহী।

নূরজাহান মুর্শিদ এবং খান সারওয়ার মুর্শিদ

আর আমিতো রেডিওতে চাকরী নিয়ে চলে আসলাম এদিকে ঢাকায়। আমি যখন রেডিওতে জয়েন করি সেটা ছিল অল ইন্ডিয়া রেডিও। এর পরপর পাকিস্তান হয়ে গেল। আমাকে অপশন দিল চাকরীটা হ'লে আমি কোথায় পোস্টিং নিতে চাই। আমি বল্লাম পাকিস্তান যাব, তবে ঢাকায় যেতে চাই না। কিন্তু সোজা আমাকে ঢাকাতেই চলে আসতে হলো। ওখান থেকে আমার সব জিনিসপত্র জাহাজে করে সব পাঠিয়ে দিল। তারপর এখানে বাড়ী টারী সব ঠিক ছিল। এসে উঠলাম এখানে। এখানে আসার পরে এক বছর পর বোধ হয় আমার বিয়ে হলো ১৯৪৮-এ। আমার কোন ভাই ছিল না । বোনদের বিয়ে হয়ে গেছে তাঁদের স্বামীরা যা ডিসাইড করল তাই হলো। সবাই প্রায় চলে এসেছিল। শেষে মা অনেক দিন ছিলেন ওখানে। তারপরে ওখানে নানা রকমের অসুবিধা। তারপর মা-ও চলে আসলেন বাড়ী টারী ছেড়ে দিয়ে।

আমি কলকাতা থেকে চলে আসার পর আমার কলকাতার রেডিও কলিগ যাঁরা তাঁদের সাথে আমার জিনিসপত্র চলে আসলো। ওঁদের গুলো যেভাবে পাঠিয়ে দেয়া হলো, আমার গুলোও সেভাবে প্যাক করে পাঠিয়ে দেয়া হলো। তারপর আমার ওখান থেকে এখানে চাকুরী হয়ে গেল রেডিওতে, অল ইন্ডিয়া রেডিওতে। তখন এখানে ছিলেন আমার বড় আপা ও বড় দুলাভাই। যখন আমি এলাম এসে ওঁদের বাড়ীতে উঠলাম। তারপর এখানে রেডিওতে জয়েন করলাম। করে কাজকর্ম করা শুরু করলাম। আমিতো প্রায় সারা জীবন ক্লাস সিক্স থেকে আরম্ভ করে এম.এ পর্যন্ত কলকাতায় ছিলাম তারপর ঢাকায় আসতে হ'লো এটা আমার জন্য খুব পীড়াদায়ক ছিল।

আর একটা বিষয় বলতে চাই যে, আমার বাবা কিন্তু খুব উদার প্রকৃতির ছিলেন। যেহেতু আমাদের ভাই ছিল না। সেজন্য বাবা চাইছিলেন যে তাঁর মেয়েগুলোকে মানুষ করবেন। একেকটাকে একটু মানুষ করেন আর

তারপর বিয়ে হয়ে যায়। আমার উপরের যে বোন তার যখন বিয়ে হয়ে গেল তখন আমার বাবা বললেন, এর পর আমার কাছে মেয়ের বিয়ে নিয়ে যে আসবে সে আমার দুশমন! হা, হা, হা...! মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব যে নিয়ে আসবে সে তাঁর দুশমন। উনি আমাকে বাড়ীতে শিক্ষক রেখে পড়াতেন তখন। প্রথম পাঠালেন চাচার কাছে। সেটা বলেছি তো। ওখানে রেখে ৩ মাস আমার পড়ার ক্ষতি হচ্ছে মনে করে তিনি বললেন, "ওখানে হবে না তোমাকে কলকাতায় নিয়ে যাই"। তারপরে আমাকে নিয়ে গেলেন কলকাতায়। কলকাতায় গিয়ে তিনি দুটো কলেজে দেখলেন ভাল করে। বেথুন কলেজ আর আমাদের ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন। আমার মনে হয় উনি ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটউশনের টিচার ও প্রিন্সিপালের সাথে কথা বলে বেশী মুগ্ধ হয়েছিলেন। যেজন্য উনি আমাকে বেথুন এ না দিয়ে ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনে দিয়েছিলেন এবং আমার প্রিন্সিপালকে বললেন, "আমি চাই ও' ভাল লেখাপড়া করুক এবং ভাল থাকুক"। প্রিন্সিপাল বললেন, 'আমরা সেটা দেখবো।'

আর একটা কথা বাবা বললেন, "আমার আর একটা খুব শখ যে মেয়েকে গান শেখাবো"। প্রিন্সিপাল বললেন, "লেখাপড়া করুক ওটা হবে"। উনি গানের কথায় তেমন গুরুত্ব দিলেন না। আমিও আর গুরুত্ব সহকারে শুনলাম না। কাজেই আমিও আর চেষ্টা করিনি যে গানের শিক্ষক রেখে দেন। উনারাও তা মনে রাখেননি ফলে গান আর শেখা হয়নি। তো বাবার দুটো শখছিল একটা হলো মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবে, আর একটা গান শেখাবে। তখন মুসলমান সমাজে অনেকেই গান, নাচ পছন্দ করতো না তার মধ্যেও কেউ কেউ গান করতো। গান কেউ শিখলেই তখন ওস্তাদজি রাখতে হতো। ওটাতে তাঁদের আপত্তি। ওস্তাদজি ছাড়া গান তুমি শিখবেই বা কেমন করে। তাছাড়া গানের স্কুল টুলতো বেশী ছিলো না যে সেখানে গিয়ে শিখবে। কাজেই আমার গান আর শেখা হলো না। আমার শিক্ষকরাও তেমন উৎসাহ দিলেন না। আমিও আর চেষ্ঠা করে গান শেখার ব্যবস্থা করিনি। যাই হউক এবার ঐ কাজটা আর হয়নি।

নিজে নিজে এমনি এমনি গান করতাম। গানটান ভাল বাসতাম গানটান বন্ধুদের সাথে দল পাকিয়ে কোরাস গাইতাম। তো আমাদের যেহেতু ইনষ্টিটিউশনে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে যে একটা পার্থক্য সেটা আমরা কোনদিন টের পাইনি। তখনকার দিনে খুব কম স্কুল কলেজে এটা ছিল। যা শুনেছি আমি। তবে আমাদের প্রিন্সিপাল, আমাদের সুপারিন্টেন্ডেন্ট তাঁরা কোনদিন কাউকে তফাৎ করে দেখেছেন এটা আমার মনে পড়ে না। এবং ওখানে মেয়ে যারা থাকতো যারা পড়াশোনা করতো তারাও খুব বন্ধু হয়ে গিয়েছিল সবাই। ওখানে কোন জাতভেদ ছিল না।

আমদের কলেজটাই ছিল কেশব চন্দ্রের বাড়ীতে। এখানে পিছনে একটা উপাসনালয় ছিল। ভ্রাহ্ম সংগীত হতো, প্রার্থনা সংগীত হতো। কলেজের ওখানে উনার একটা ঘর, উনার মত করে রাখা। উনার বেডরুম বোধ হয়। ওরকম করে রাখা ছিল ওখানে উনার স্মৃতি রাখার জন্য আরকি। কলেজে আমরা তখন ৪/৫ জন মুসলমান মেয়ে ছিলাম। আমার সিনিয়র ছিলেন ২জন। আমরা একদিন বসে আলাদা করে গল্প করছি যে, আমরা কি ওদের প্রার্থনায় যাব কি যাব না। তখন আমাদের আনোয়ারা আপা আমাদের সিনিয়র ২ বছরের। বললেন যে, দেখ ওদের প্রার্থনায় গানগুলো এত সুন্দর ওখানে না যাওয়ারতো কোন মানে হয় না। তখন ঠিক করলাম যে, না আমরা প্রার্থনায় যাব গান করি বা না করি। ঘুম থেকে উঠেই প্রার্থনা করে তারপর খেতে যাওয়া। গানগুলো বেশীরভাগই ভ্রাহ্মসংগীত যেমন ঃ অন্তর মম বিকশিত কর অন্তর মম হে!

সুন্দর সুর করে গানের লাইনটি গাইলেন তিনি।

তবে গান আমি খুব ভালবাসতাম। গান শুনলে আমি পাগল হয়ে যেতাম। মনে আছে রাত্রে হয়তো ঘুমিয়ে আছি দূর থেকে কোন গান ভেসে আসছে। আমি উঠে লাফিয়ে পড়ে যাই বিছানা থেকে, এরকম! ছোটবেলা

থেকে আমার বাবাও খুব গান পছন্দ করতেন। গান আমরা মোটামুটি সবাই পছন্দ করি। তবে গাইতেতো আর পারি না!

এমন একটি আক্ষেপপূর্ণ বাক্যদিয়ে শেষ করলেন তাঁর এ পর্বের কথা বলা।

আন্দোলনে তাঁর সম্পৃক্ত হওয়া নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি সেসময়টাকে এমন ভাবে সামনে নিয়ে এলেন ঠিক যেন একটি প্রমাণ্যচিত্রঃ

এম.এ পাশ করলাম ১৯৪৬-এ। পূর্ব-পাকিস্তানে আসলাম ১৯৪৭-এ।

তখন কোন সময় ধরো আমি মুন্নুজান হলে আসার আগেই আন্দেলনতো শুরু হয়ে গেল। তখন হলো কি এডুকেশন বিভাগ থেকে মুসলমান মেয়েদের লেখাপড়ার অসুবিধা আছে বলে তারা মুন্নুজান হল নামে একটা হল তৈয়ার করল। যাতে মুসলমান মেয়েরা ওখানে যেতে পারে। আমি তখনও পড়াশোনা করি। তখন আমাকে বলল, ''আপনি ঐ হলটার দায়িত্ব নেন এখন আপাতত।" তখন সিনিয়র কেউ ছিলনা তাই আমি মুন্নুজান হলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হলাম। আবার তখন আমি পড়াশোনাও করতাম। বি.টি পড়ছিলাম। এম.এ পাশ করার পর। তো তখন মুন্নুজান হলটা ছিল হেরিসন রোডে। তারপর হলো কী ১৯৪৬-এ দাঙ্গার সময় আমাদের মুন্নুজান হল থেকে অনেক মেয়ে এবং আমিও গেলাম, একটা মিটিং হবে। কোথায় মিটিংটা হবে? ইসলামিয়া কলেজের মাঠে মিটিং হবে। ওয়েলেসলি স্ট্রীটে তখন আমার বাড়ী আর হোষ্টেল হলো হেরিসন রোডে। হেরিসন রোড থেকে ঐ ইসলামিয়া কলেজ পর্যন্ত আমরা হেঁটে গেলাম। কারণ তখন হরতাল ছিল। গাড়ী, ঘোড়া, ট্রাম, বাস সব বন্ধ ছিল। মেয়েদেরকে বললাম তোমরা যারা যারা যাবে তারা চলো। বেশ কয়েকজন মেয়ে আমরা গেলাম। সেখান থেকে আমরা হেঁটে গেলাম রিপন স্ট্রীটে। রিপন স্ট্রীটে আমাদের আবুল হাসেম সাহেবের একটা পত্রিকা অফিস ছিল, মিল্লাত অফিস। শুনেছ নিশ্চয় তোমরা এর নাম?

মিল্লাত অফিস ছিল রিপন স্ট্রীটের একতলায়। তো আমরা প্রথমে রিপন স্ট্রীটে গিয়ে উঠলাম। সবাই বলল যে হলে এখন থাইকেন না। তাই ওনার ওখানে গিয়ে ভাবলাম কিছুক্ষণ থাকবো, পরে চলে আসবো। অন্য মেয়েরা কেউ কেউ চলে গেল বাড়ী। কেউ কেউ আমার সঙ্গে আসলো। তারপর দেখি যে না রাত্রে সব রায়ট শুরু হয়ে গেল বিভিন্ন জায়গায়। তখন মনে হয় আমরা যেখানে আছি মিল্লাত অফিসে তার চারিদিকে বোমা পড়ছে, বারুদ পড়ছে, মনে হয় যুদ্ধের মাঝখানে আছি। এরকম আরকি ! ওখানে আটকা পড়ে গেলাম। সেখানে অন্য মেয়েরাও আসলো আবার। আবুল হাসেম সাহেব সাহস করে আমাদের জন্য সকাল বেলা বার হলেন। আমাদের জন্য কিছু চাদর টাদর কাপড় চোপড় ভিক্ষা করতে। কিছু কাপড় চোপড় ও চাদর নিয়ে আসলেন। এসে বললেন তোমরা এগুলো ব্যবহার করো এবং কাজে লাগাও। তো উনার কিচেনে বলে দিলেন রান্নাবান্না করতে। আমরা ওখানে আস্তানা গাড়লাম। উনার ফ্লোরে শুয়ে আর ওখানে খেয়ে ক'টা দিন কাটালাম।

একজন শাড়ী ধুয়ে শুকাতে দিত পরে আর একজন পড়তো। এরকম আর কি ! আবুল হাসেম সাহেব আবার বের হলেন কয়টা কাপড় কিনে নিয়ে আসলেন। আমরা খুশী হলাম কাপড়গুলো পেয়ে। নতুন কাপড় পরা যাবে। ইয়াং বয়স বলে এগুলো সহ্য করা গেছে। এখনকার সময় হলে অসম্ভব! ফ্লোরে শুয়ে, মাথায় একটা বই বা ইট এভাবে কিছুদিন কাটালাম।

তখন তো সোহরাওয়ার্দী সাহেব প্রধানমন্ত্রী। একদিন কাশেম সাহেব গিয়ে আমাদের দেখে আসলেন। তারপর একদিন কাশেম সাহেবকে বললাম যে আমি একটু বাইরে যাব আপনার সঙ্গে ঘুরবো। উনি যেখানে যেখানে গেলেন আমিও সেখানে সেখানে গেলাম। কামিনীদির সাথে দেখা করলেন, আমিও করলাম। ঘুরে টুরে

তারপরে আমি বললাম আমি আমার হোষ্টেলটা একটু দেখে আসতে চাই। তো বললেন চলো তারপর হোষ্টেলের দিকে যাচ্ছি দেখি কি হোষ্টেলের নীচে থেকে উপর পর্যন্ত তিন তলায় সব ভাঙ্গা কাঁচ, আর কাগজের টুকরো, বোতল ভাঙ্গা, ক্লিপ ভাঙ্গা মানে হাঁটা যায় না। তারপর ওখানে পথ করে করে আমি উপরে আমার বেড রুম পর্যন্ত গেলাম। গিয়ে দেখি আমার ঘরে খাট টাট ওরা বলে বাইরে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। চেয়ার টেবিল আছে। বাকীগুলো সব ফেলে গেছে, কিন্তু লুটপাট করেছে। তো ফ্লোরের মধ্যে দেখি, আমি খামে করে টাকা রাখতাম তোষকের নীচে, খামটা আছে খামটা খুলে দেখি টাকাগুলোও আছে।

তখনকার দিনে ৭৫ টাকা অনেক টাকা। তো ওটা পেয়ে নিলাম। আরেকটা খামের মধ্যে আমার বাবার মৃত্যুর আগের ছবি। আমি ভাবলাম এদুটোর জন্যই আমি এসেছিলাম এখানে। তারপর চলে এলাম। বাড়ীতে ঢুকে মন খারাপ হয়ে গেল। এত খারাপ অবস্থা দেখবো তা ভাবিনি। ওয়ালগুলো মনে হয় খামছে খামছে কেটেছে। আমার হোষ্টেলটায় শুধু মুসলমান মেয়েরাই থাকত। কেন, কারা করল জানতে পারলাম না, কেন এটা হলো? তারপরতো আমরা চলে এলাম দরগা রোডে। এখানে নতুনকরে মন্নুজান হল করা হলো। তখন এম.এ শেষ হয়েছে। বি.টি আর করা হলো না। ভর্তি হয়েছিলাম। মুন্নুজান হলের সুপার হলাম। পড়াশোনা করছিলাম তারপর এখানেই থাকলাম।

আমি যখন মুন্নুজান হলে থাকি তখন আমাদের একজন সহকর্মী জেবুন নেসা। আমাকে বলল চলো আমরা অল ইন্ডিয়া রেডিওর ভিতরটা গিয়ে দেখে আসি। ওর পরিচিত লোক আছে। আমাদের ঘুরে ঘুরে দেখাবে। আমি বললাম চলো যাই। দুজনে গেলাম। জয়নাল আবেদিন ছিলেন এ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর উনি মুসলমান মেন্টালিটির ছিলেন। তো উনার সাথে দেখা করলাম। শুধু অভ্যর্থনাই করলেন না উনি ইয়ে করলেন সঙ্গে নিয়ে দেখাতে শুরু করলেন আমাকে বিভিন্ন জায়গায় কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে।

এক পর্যায়ে জানতে চাইলেন আমি কি করি। বললাম, আমিতো ওখানে আছি হোষ্টেল সুপার হিসাবে। জয়নাল সাহেব আমাকে চাকরীর অফার দিলেন। বললেন এখানে পার্ট টাইম কাজ করতে পারেন, তাতে কোন অসুবিধা হবে না। তো পার্ট টাইম প্রথমে পেলাম। তারপর আমাকে আর একটা ইন্টারভিউ নিয়ে ওখানে পারমানেন্ট করলেন। পারমানেন্ট করলেন এ্যাজ এ প্রোগ্রাম অফিসার। তখন এর মধ্যে দেশ ভাগ হয়ে গেল। আমিও ইন্টারভিউ দিয়ে ওখানে পারমানেন্ট হলাম আবার এখন দেশ ভাগ হলো। আমাকে বললো আমি কি পাকিস্তানে চলে যাবো নাকি ইন্ডিয়াতে থাকব। না আমি বললাম যে আমি পাকিস্তানে যাবো। তখন পাকিস্তানে যাবো আবার ওখানেও থাকবো তাতো হয় না। তখন আমাকে চুজ করতে হল ঢাকা অথবা করাচী। তখন আপাতত: ঢাকাতে এলাম। একটা মজার কথা, আমাকে ইন্টারভিউ যখন করছে তখন বলে, আপনার চাকুরীটা যদি হয় আর আপনাকে আমরা যদি বদলি করি তাহলে আপনার কোন আপত্তি হবে নাতো? তখন আমি বললাম আপত্তি হবে না। যে কোন জায়গায় যেতে পারি। কিন্তু, আমি ঢাকায় যাব না। হা, হা, হা...!

কারণ ঢাকার এত বদনাম শুনেছিলাম, ওখানে মারামারি হয়। এটা একটা ব্যাকওয়ার্ড জায়গা, একটা ব্যাকওয়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট। মানে ভীষণ বদনাম শুনতাম ঢাকার কলকাতায় বসে। তবে এই ঢাকাতে যে জীবন কাটাতে আসব এটা জানতাম না।

আমার বিয়ে হলো ৪৮-এ। ৪৯ এবং ৫০ চাকরী করলাম। আবার ছেড়েও দিলাম। এটা আমার একটা পরাজয় বলে আমি মনে করেছিলাম সেই সময়ে। কারণ আমি যখন ওখানে বেশ ভালভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারলাম। তখন ভাবছিলাম একটা কেরিয়ার করবো। এবং বেশ লোকের সমর্থনও পাচ্ছিলাম আর বিশেষ করে আমি প্রথম মহিলা বলে সবাই খুব উৎসাহ দিয়েছে আমাকে এবং সবাই খুব অভিনন্দন জানিয়েছে। যার ফলে আমি আরো উৎসাহ বোধ করেছি এবং আমার যা দায়িত্ব তার অতিরিক্ত দায়িত্ব অনেক

সময় পালন করতে হয়েছে এবং করেছি আনন্দের সাথে। কাজেই যখন আমাকে এটা ছাড়তে হলো। তখন এটা আমার জন্য একটা কষ্টকর বৈকি! আমার মনে হলো যে এরপরে আমি অন্য কোথাও কাজ করতে পারবো না। কিন্তু কিছুদিন থাকার পর ভাবলাম না, ঘরেও তো বসে থাকা যাবে না। তখন প্রথমে আমাকে অফার করল নতুন হলিক্রস কলেজ। কলেজ না স্কুল তখন প্রথম আরম্ভ হয়েছে এবং সেখানে দুইজন সিস্টার খুঁজে খুঁজে আমার বাড়ীতে আসলেন। বাড়ীতে এসে বললেন আমরা এরকম একটা স্কুল কলেজ করব এবং আমরা অনেকখানি কাজ এগিয়েছি। এখন যদি আপনি আমাদের সঙ্গে থাকেন। আমাদের সঙ্গে আসেন এবং আমাদের এখানে একটা কাজ যদি আপনি গ্রহণ করেন আমরা খুব খুশী হবো।

তো আমি এ্যাকসেপ্ট করলাম। আমি বললাম ঠিক আছে। আমি একটু ভেবে দেখি, তারপর আমি ভেবে চিন্তে গেলাম এবং বললাম অমুক তারিখ থেকে আমি জয়েন করবো। তো আমি তারপর হলিক্রস কলেজে জয়েন করলাম। ওখানে কিছুদিন কাজ করার পরে কেন সেই চাকরীটা ছাড়লাম তা আমার কিন্তু এখন ঠিক স্মরণে নাই।

এই সময় আমার হেলথেরও অসুবিধা ছিল। তো কাজটা অনেকদিন স্থগিত ছিল। কাজটা আস্তে আস্তে ছেড়ে দিলাম পরে আমি আবার বিভিন্ন স্কুল কলেজে গেলাম যেমন কামরুননেসাতেও কাজ করেছি, ভিখারুননেসাতেও কাজ করেছি। তারপর আমাদের ইউনিভার্সিটিতে যে ঐ একটা ল্যাবরেটরী স্কুল ছিল ওখানেও কাজ করেছি ফয়জুন নেসা তখন প্রিন্সিপাল ছিল। ফয়জুন নেসা আমাকে নিয়ে গেল, ওখানে। ফয়জুন নেসার সাথে আমি ভিখারুননেসাতেও ছিলাম। ওখানেও গেলাম। তো ওখানে বেশ কিছুদিন থাকলাম।

আরও আগে প্রথম যেটা চাকুরী পেয়েছিলাম শিক্ষকতার সেটা হলো বরিশাল সাইদুননেসা গালর্স হাই স্কুলে হেডমিষ্ট্রেজ হিসাবে। সেখানে বরিশালে আমার চাচা ছিলেন বি.এম কলেজের প্রফেসর। তো উনি আমাকে একটা চিঠি লিখলেন। তখন আমি ঐ মুন্নুজান হলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট। উনি একটা চিঠি লিখলেন যে, এখানে একটা মহিলার দরকার আছে ইয়েতে হেডমিষ্ট্রেজের জন্য তো তুই জয়েন করবি নাকি? তো আমি শুনে চলে গেলাম। আগে দেখি কি অবস্থা তারপর জয়েন করবো। তারপর ওখানে দেখলাম যে তখন নতুন ফজলুল হক সাহেব তো ঐ কলেজ করলেন, স্কুল করলেন, করে উনার মায়ের নামে করলেন ''সাইদুননেসা গালর্স হাই স্কুল" আর হোষ্টেল টোষ্টেল সুন্দর করলেন। তো আমি জয়েন করলাম। জয়েন করে ওখানে তখন থাকা শুরু করলাম এবং আমার চাচা থাকতেন বরিশাল বি.এম কলেজের কাছে। আর আমি এখানে। তো সেখানে একাডেমিক শিক্ষক হিসাবে প্রথম চাকরী আমার। তো মনটা একটু দুরু দুরু লাগত। কারণ যারা ওখানে পড়তে আসছে তারা প্রায় বেশ যথেষ্ট একটু গ্রাম থেকে আসা সবতো, বেশ একটু বয়স। তো যাই হোক সবাই কিন্তু খুব সহযোগিতা করেছে এবং ওটাই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। এবং খুব ভাল অভিজ্ঞতা।

তারপর তিনি রাজনীতিতে কিভাবে যুক্ত হলেন তা খুবই আগ্রহের সাথে বিস্তারিত বললেনঃ

হ্যাঁ, দিস ইজ ভেরী ইন্টারেষ্টিং পয়েন্ট, আমিতো চাকরী করছিলাম এখানে সেখানে। রাজনীতিতে আমার শ্বশুর সাহেব তখন মুসলিম লীগের এম.এল.এ ছিলেন এবং উনার ইচ্ছে যে আমি রাজনীতিতে প্রবেশ করি। তখন একমাত্র আনোয়ারা বেগম ছিলেন এম.এল.এ এবং এর আগে এক মহিলা নেইলি সেনগুপ্ত উনি ছিলেন। তো আমার শ্বশুর চাইলেন যে আমি রাজনীতিতে যাই।

এর আগে আমাদের যে রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা সেটা বাম রাজনীতির কথা বলছিলাম। তখন দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে। তখন যে প্রতিষ্ঠানের সাথে আমরা যুক্ত ছিলাম সেখানে যেমন সহিদুল্লাহ্ ছিল। তারপরে ইয়ে

ছিল খালেক একজন পরে সি.এস.পি অফিসার হয়েছিল। তারপর আমাদের জাস্টিস মাসুক উনি খুব উৎসাহ দিলেন। তো তারপর ব্যারিষ্টার লতিফ ছিল। তারপর খুব উগ্র উঠতি ইন্টেলেক্চুয়্যাল যারা মোটামুটি তারা এটা সমর্থন করলেন সবাই থাকল। সেখানে আমরা ওটার নাম দিয়েছিলাম ''ঘরোয়া"। তো ঐ প্রতিষ্ঠানটা কিছুদিন পরে আর এগোলো না। ওটা কলকাতাতেই ছিল। তখন আমাদের ঘরোয়াটা হিন্দু মুসলমান মিলে ছিল। যখন দেশ ভাগ হলো তখন ওটা আস্তে আস্তে ভেঙ্গে গেল। ভেঙ্গে গেল তখন আমরা মুসলমান ছেলে মেয়ে চেষ্টা করলাম আর একটা প্রতিষ্ঠান গড়তে। ওটার নাম যেন কি একটা দিলাম। ওটাও আর তেমন দাঁড়ালো না। কিন্তু এখানেও আমরা চেষ্টা করলাম।

তারপরে তো আমি চলে আসলাম ঢাকায় অপশন যখন দেওয়া হল। ঢাকায় কিছুদিন করার পর রেডিওর চাকরী আমি ছাড়লাম। তারপর হলিক্রস কলেজে চাকুরী করলাম, কামরুননেসা স্কুলে তারপরে আমাদের ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুল, আরো আগে সাইদুননেসা স্কুল এই আমার শিক্ষকতা জীবন আগেই বলেছি।

ইষ্টপাকিস্তান পলিটিক্সে যখন আমি ঢুকলাম তখন পলিটিক্সটা মাত্র শুরু, মেয়েরাতো খুবই কম। একমাত্র আনোয়ারা বেগম ছিলেন। তো যাই হউক আমার শ্বশুরের ইচ্ছেতে পলিটিক্সে আসা এবং আমার ছোট বেলায় বামপন্থী রাজনীতির কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। সেখানে আমরা কিছু কাজকর্ম করতাম। পলিটিক্স বলতে আমরা সেটাই বুঝতাম। কিন্তু এখানে হলো এখন তোমার অন্যরকম পলিটিক্স। এটা তো যাই হউক পলিটিক্স করতে করতে পলিটিক্স বুঝা।

আমার শ্বশুর ছিলেন মুসলিম লীগে। তখন মুসলিম লীগ ছাড়া অন্য কোন দল ছিলনা। মুসলিম লীগ থেকে উনি আসলেন এসে পরে উনি আওয়ামী মুসলিম লীগ করলেন। প্রথমে আমাকে উনি তাঁর দলে টানেননি। উনি বললেন যে, মেয়ে নাই একমাত্র আনোয়ারা আছে তো নির্বাচনের আগে দিয়ে নাম লিখে দিলেন।

হ্যাঁ, এটা হল ১৯৫৪ সাল। তখন আবার আমি সন্তান সম্ভবা এবং তখন আমি এ নির্বাচনের ক্যানভাস করে বেড়াই একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ট্রাকে উঠে ফর দোজ ডেজ। তবে তখন ১৯৫৪'র নির্বাচনটা এমন হয়েছিল এত মানুষ কেন উৎসাহ দিল, কেন এত মানুষ জয়েন করলো এবং এত ঝাপিয়ে পড়লো সবাই? এটা আমার কাছে এখনও আমি ঠিক বুঝি না এরকম নির্বাচন আমি কখনও দেখি নাই। এবং কোথায় না সমর্থন পাচ্ছি। তার কোন ঠিক নাই।

আমি যখন নির্বাচন করেছি তখন সো ফার এ্যাজ আই রিমেম্বার দশজন মহিলা ছিল তখন নির্বাচনের সময়। ভোটে ডাইরেক্ট ইলেকশন তখন ছিল। মহিলাদের সিটে তখন ডাইরেক্ট ইলেকশন হতো। হ্যা, আমাদেরকে ছেলেরা ভোট দিয়েছে মেয়েরাও ভোট দিয়েছে, ডাইরেক্ট ভোটেই আমরা এসেছি।

এরকম, তো আমাদের বিভিন্ন এলাকাগুলো অনেক বড় ছিল। এবং যেহেতু দশজন মহিলা গোটা দেশকেই দশ ভাগে ভাগ করেছে। তাহলে তোমাকে ডিভিশনগুলো নিতে হচ্ছে। বড় বড় এরিয়া নিতে হচ্ছে। এবং আমার এরিয়া ছিল ঢাকা, নারায়নগঞ্জ এবং নারায়নগঞ্জের ওপার শীতলক্ষার ওপারটাও। তো এই সমস্ত জায়গা ঘুরা এবং সবার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা একটু কঠিন ছিলো। যাই হউক তো আমি সে কাজগুলো তখন আনন্দের সাথেই করেছি এবং মনে হয়েছে একটা কিছু করছি, একটা কিছু করছি। এবং আমরা তখন কয়জন, দশজন। আমার সংসদে সেই সঙ্গে ছিল দৌলতুন নেসা, বদরুন নেসা, জিয়া ভানু ফজলুল হক সাহেবের নাতনী, আর একজন মহিলা ছিলেন মেহেরুন নেসা তিনি চট্টগ্রামের কোন মন্ত্রী ছিলেন আগে তাঁর মেয়ে। আর ছিলেন তপতুন নেসা, আরোও একজন মহিলা সব নামগুলো মনে নাই। তবে কিছু কিছু নাম মনে আছে। তো এঁদের মধ্যে আমেনা খাতুন ছিলেন খুব এ্যাক্টিভিষ্ট এবং দৌড়াদৌড়ি করতে পারতেন খুব। আর আমরা ছিলাম মাঝামাঝি। এই আমার প্রথম নির্বাচন এবং সেই নির্বাচন প্রাউড হয়ে গেল না কি হলো জানিনা!

এরপরে শেখ সাহেবের সময় আবার নামলাম। তো মনে আছে যখন আমি নোমিনেশনের জন্য গেছি আমাকে শেখ সাহেব বলেছেন, যে আপনি একটু সহিদুল্লাহ সাহেবের সাথে দেখা করেন। দেখা করে, আপনি বলেন আপনার ক্যান্ডিডেচারের কথা আপনি যান। তো আমি দেখা করলাম। তারপর উনি কথা টথা বললেন যে, আমরা ভাবছি এবারের নির্বাচনে আমরা কোন মেয়ে টেয়ে নেব না। সহিদুল্লাহ সাহেব একথা বললেন, আমি চলে আসলাম। তারপর খবরের কাগজ খুলে দেখি আমার নাম। উনার একটা সেন্স অব হিউমার ছিল এরকম আর কি! তো মনে পড়ে এসব কথাগুলো। আর আমি সেই সময় আবুল হাসেম সাহেবের খুব কাছাকাছি আসার সুযোগ পেয়েছিলাম। কারণ উনার ঐ রিপন স্ট্রীটের যে মিল্লাত অফিস ওখানে ঐ দাঙ্গার পরে এসে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম। এবং ওখানে উনার সঙ্গে উনি এত কথা বলতে ভাল বাসতেন। তো আর আমাকে বলতেন যে, খবরের কাগজ পড়ে পড়ে শুনাও। উনি চোখে একটু কম দেখতেন। তখনও বুঝতে পারলাম যে লোকটা যতটুকু বুঝেন, ততটুকু যদি কাজ করবার সুযোগ পেতেন তাহলে অনেক ভাল হতো। কিন্তু উনি সময় উপযোগী হলো না বোধ হয়। সেই সময় তারপর সহীদ সাহেব বাছাই করে করে লোক নিলেন এবং আমরা নির্বাচন করলাম। এই হলো আমার প্রথম জীবনের রাজনীতি।

তারপরেরগুলো শেখ মুজিবর রহমানের সময়, দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ও পরে। আমরা তো জানতাম না যে হঠাৎ করে আমরা এরকম একটা আন্দোলনে পড়ে যাবো। একটা আন্দোলন হচ্ছে যা হচ্ছিল তা এটা যে ঐ পর্যায়ে চলে যাবে এটা আমরা কিন্তু ভাবিনি। এবং সেই সময়টা আমাদের জন্য একটা বিশেষ সময়। ৪টি ছেলে মেয়ে তখন ছোট ছোট এবং আমাদের ইউনিভার্সিটির এরিয়াটা। এটা কত তারিখ, এটা কিন্তু আমি প্রায় ৭১-এ চলে এসেছি। তো সে সময়েও আমি গেলাম কোন এক মিটিং-এ। শেখ সাহেব এসছেন, সবাই এসছে আমারা যে একটা গুরুতর পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে যাচ্ছি এ কথাটাই বুঝানো হলো। এবং বললেন যত তাড়াতাড়ি তোমরা সব নিজের বাড়ী চলে যাও।

হ্যাঁ, এটা মার্চ মাস। তো আমি যখন রওনা হয়েছি তখন গাড়ী পাই না। আমার তখন গাড়ী ছিল না। তারপর অন্য কোন রিক্সা টিক্সাও নাই। যার সাথে গিয়েছিলাম সে আগেই চলে গেছে। তারপর আমি কোন রকমে একটা রিক্সা করে গেলাম তাজউদ্দিন সাহেবের বাড়ীতে একটু কাছেই ওখানে গিয়ে উঠলাম। এর মধ্যে এদিকে ওদিকে গোলাগুলি শুরু হয়েছে। তো দেখি যে তাজউদ্দিন সাহেব একটু বকাবকি করছেন, চেঁচামেচি করছেন। তো আমি জহুরাকে জিজ্ঞেস করছি কি তাজউদ্দিন ভাই চেঁচামেচি করছেন কেন? ''না, কি কি কাপড় গুছিয়ে রাখতে বলেছিল আমাকে, আমি রাখতে পারিনি সেজন্য আমাকে বকছে"। আমি বুঝলাম তাহলে তো তাজউদ্দিন সাহেবই যখন কাপড় গুছিয়ে রাখতে বলেছেন তখন ব্যাপার কিছু একটা হতে যাচেছ। আমি বললাম তাহলে আমি চলি। আমি আর সময় নষ্ট করিনা। তারপর আমি বাসায় চলে গেলাম ইউনিভার্সিটির কোয়ার্টারে। গিয়ে দেখি বেশ থমথমে আবহাওয়া। সব নিঝুম আর বাড়ীতে কেউ নেই। আমি বললাম যে, সবাই মিলে কোথায় গেল এরকম সময়ে। যাই হউক পরে আমার ছেলে আসল এসে বলল যে, আম্মা ইউনিভার্সিটির ক্লাবঘর রক্তে রক্তাক্ত। তখন বোধ হয় রাত ৯টা ১০টা হবে, ১০টা হবে। এবং বলে যে, মনে হয় যেন সব রক্তে প্লাবিত। তখন আমি ভাবলাম তাহলে তো মারাত্মক! গোলাগুলির আওয়াজ হচ্ছে। এখানে নানান রকম কিছু হচ্ছে বুঝতে পারছি। ফুরফুর করে আগুন উঠছে উপরে। আমরা ভয়ে সব খাটের নীচে ছেলে পেলেকে ঢুকিয়ে রাখছি। এই ত্রাসের মধ্যে এসে তো সবাই একত্রিত হলাম। আর রাতটা ঐভাবে কাটলো ফ্লোরে খাটের নীচে ছেলে পেলেকে রেখে নিজেরা মাথাটা খাটের নীচে ঢুকালাম আর ফ্লোরে শুলাম। তারপরে ভোর, তবুও অন্ধকার, ঘুমওতো হয়নি। জানলাটা খুলে বাইরের দৃশ্যটা আমি দেখি যে, কতগুলো ইয়ে আর্মির লোকেরা বন্দুক ঘারে করে বিভিন্ন জায়গায় টহল দিচ্ছে। দাঁড়িয়ে আছে, আর তাকিয়ে থাকতে থাকতে

কয়েকজন ৪/৫ জন একটা বাড়ীর ভিতর দৌড়ে গিয়ে ঢুকলো। তখনও ভোর অন্ধকার। তখন আমি মুর্শিদ সাহেবকে বলছি শুনছো, এরা ঘরে ঘরে ঢুকে মানুষ মারছে। এতক্ষণ ভাবছিলাম বাইরে যেওনা আমরা ঘরে থাকি, তাহলে মারবে না। এখন তো দেখছি ওরা ঘরের ভিতর ঢুকে ঢুকে মানুষ মারছে। তো উনি বললেন যে, থাক জানালা বন্ধ করে দাও। এই অবস্থায় ঐ কোন রকমে, কোন রকমে ঘরের মধ্যে মাথা গুজে গুজে চুপচাপ থাকা যেন ঘরে কেউ আছে এটা টের না পায়। সেদিন গেল। তারপরের দিনতো কারফিউ। তারপরের দিন যখন কারফিউটা উঠল সকালে আমার এক চাচাত ভাই, আমার এক বোনের ছেলে অন্যান্য আত্মীয় স্বজনরা সব এসে হাজির। শীঘ্রই বার হয়ে আসো ইউনিভার্সিটি এরিয়ায় থাকা যাবে না। তো আমার চাচাত ভাইটাও আবার খুব ভাল উর্দু বলে। তো ও বলে কি যে, আমার গাড়ীতে চলো তাহলে মোটামুটি নিরাপদে যেতে পারবে তোমরা এখন আমার বাড়ীতে চলো। তো আমাদের ওর বাড়ীতে নিয়ে গেল, তার বাড়ীতে রাখলো। একটু ভিতরে ওর বাড়ীটা ধানমন্ডির ভিতরে। আমরা ৩ ভাগে ভাগ হয়ে গেলাম, আমার এক বোনের কাছে থাকলো আমার ২ মেয়ে। আর এক ভাইয়ের কাছে থাকলো আমার ২ ছেলে। আর আমরা দুইজন আসলাম এই ভাইয়ের কাছে। আমার ভাই বললেন যে আপনারা চুপ চাপ ঘরে বসে থাকেন, খাওয়া দাওয়া করেন আর ঘুমান। বই পড়েন, কিন্তু বাইরের দিকে একেবারেই যাবেন না। তো মুর্শিদ সাহেব তো কথা শুনার মানুষ না। উনি কি করেন পট করে বেড়িয়ে যায়। কোথায় গেল, কোথায় গেল, ভয়ের কথা তারপর সারাদিন আসছে না।

আমার ভাই বলল বুবু, এরকম হলে তিনি নিজেও বিপদে পড়বে আমাদেরও বিপদে ফেলবেন। তো উনি যখন আসলেন তখন আমি বললাম যে, শুনো তুমি যে ভাবে চলছো এখন এভাবে চললে হবে না। তোমাকে এখন বুঝতে হবে আমার ভাইয়ের বাড়ীতে আমরা বন্দী হয়ে থাকতে এসছি। উনাকে কিছুতেই বুঝাতে পারছি না যে, এ সময়টা তোমার যা খুশী করার সময় না। তারপর আমি বললাম, না তাহলে এখানে আর থাকা যাবে না। তখন আমি বললাম, চলো আমরা গ্রামের দিকে চলে যাই। শহরে থাকা আমাদের জন্য হবে না। চলো কোথায় যাব হয় তোমার গ্রামে, নয়তো আমাদের গ্রামে। আমার গ্রামতো সেই মর্শিদাবাদ আরেক দিকে। তাহলে চলো আমাদের কুমিল্লার গ্রামে। চলো যাই ওখানে গিয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থাকবো। তো আমার ভাই সেই জুব্বা জাব্বা পড়ে টরে একটা গাড়ীতে করে আমাদের নিয়ে আস্তে করে উঠিয়ে দিলেন লঞ্চে। আমরা বোরখা টোরখা পরে টরে কোন রকমে ময়লা কাপড় পড়ে পুটলা টুটলা নিয়ে জিনিস সব ফেলে অত্যন্ত সাধারন রিফুজির মত। মুর্শিদ সাহেবের মুখের দাঁড়ি খোঁচা খোঁচা এত বড় বড় গোঁফ কেউ কাউকে চেনার উপায় নাই। সেই ভাবে আমরা ঐ লঞ্চে উঠলাম। উঠে গেলাম কুমিল্লাতে। কুমিল্লাতে নেমে ওদের নিজেদের বাড়ীতে তো কেউ থাকে না। চাচা শ্বশুরের বাড়ী টারী আছে। তো একটা বাড়ীতে উঠলাম। প্রথম দিন আদর টাদর হল। দ্বিতীয় দিনও চললো মোটামুটি। তারপরের দিন দেখি মুখটা একটু উঁচু উঁচু, ভারি ভারি আমরা কতদিনের জন্য এলাম এটা তাঁদের প্রশ্ন।

ততদিনে সব জানাজানি হয়েগিয়েছিল ঢাকাতে কি হয়েছে। আমার ঠিক মনে নাই হয়ত অনেকে বিশ্বাস করেছে হয়ত অনেকে করেনি। তবে ওরা থার্ড ডেতে বললো যে, তোমরা এখানে আছো ব্যাপারটা কিন্তু জানাজানি হয়ে গেছে। এখন তোমাদের জন্য অন্যরাও বিপন্ন হবো। আমি মুর্শিদ সাহেবকে বললাম, তোমাকে তো ঘরে রাখা যাচ্ছে না। চলো আবার পুটলা পুটলি নিয়ে এখান থেকে রওনা হই। এবার একেবারেই সত্যিকার নিরুদ্দেশের পথে। এবং আমরা কি করলাম সন্ধ্যের সময় বার হলাম। বার হয়ে নদীর ঘাটে গিয়ে একটা নৌকা ঠিক করলাম। যে আমরা কালকে খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে আমরা নৌকা করে যাবো। কোথায় যাব, যাব ধর ইয়ের দিকে ওখানে কিন্তু ভারতের কোন জায়গায়, আগরতলা। ঐ দিকে ধরো ঐ দিকে যাব।

তবে আমরা অতদুর যাব না, তখনও আগরতলা পর্যন্ত যাব ভাবিনি। তো উঠে দেখি কোন গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারি কিনা এরকম। তো উঠলাম নৌকায়, উঠে যাচ্ছি। কিছুদূর গিয়েছি পরে দেখি যে এক ভদ্র লোক ঐ বসাছিল বোধ হয়। নদী সব ভরাট হয়ে গেছে। ভদ্রলোক এতখানি পানিতে নেমে বোধ হয় মুর্শিদ সাহেবকে দেখে চিনতে পেরেছেন। হাত উঠিয়ে স্যার স্যার করছে। তো উনি বলছেন যে দেখি তাহলে এদিকে একজন পরিচিত মনে হচ্ছে লোক আছে। তারপর ওখানে আমরা গেলাম। আজকাল নামটাও ভুলে গেছি। ওদের ওখানে ছোট খাটো ভাল বাড়ী আছে। আর এক অফিসার এক ভদ্রলোক উনার নামটাও এখন মনে পড়ছে না আমার। তার ফ্ল্যাটটা খালি আছে। তো ভদ্রলোক ওটা খুলে দিলেন আমাদেরকে বললেন তোমরা এখানে চুপচাপ থাকো। তারা খাবার দাবার পাঠাতো। কয়দিন থাকার পর মুর্শিদ সাহেব বলল, ভাই এরকম করে আর কতদিন থাকা চলবে। এরকম করে তো আর থাকা যায় না। চলো আমরা গ্রামের দিকে রওনা হই। সেখানে গিয়ে নিজেরা কিছু করার চেষ্টা করি। তাঁদের কাছ থেকে বিদায় টিদায় নিয়ে তাঁদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে আবার নৌকা করে রওনা হলাম। এবার নৌকা করে রওনা হয়ে ভাবলাম আর দেশের ভিতরে থাকা যাবে না। কারণ অন্যেরা ভয় পাচ্ছে এখন আমাদেরকে। যে তোমাদের জন্য আমরা বিপন্ন হবো। তো আমরা এখন আগরতলার দিকে চলে যাই। গেলাম আগরতলা। ওখানে নেমে দেখি ওখানে কতগুলো রিক্সা। আমরা যাচ্ছি যে ওখানে ওরা ভয় পাচ্ছে না। বলছে যে এখানে আসেন, আসেন আমরা পৌঁছে দিব। ওখানে একটা ঐ এম.পিদের হোষ্টেল আছে। বলে কি যে ওখানে অনেকেই এসেছে বাংলাদেশ থেকে। আপনারা ওখানেই চলেন। ওরা সাহায্য করলো। আমরা ওখানে গেলাম ৪টি ছেলে মেয়ে নিয়ে। ওখানে যাওয়ার পরে একটি ঘরে আমাদের থাকতে দিল। আপনাদের কিন্তু এখানেই থাকতে হবে। আর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আমরা দেখছি কিভাব কি করা যায়। আরো আছে অনেকে এসছে।

তারপর আমরা বসে আছি ভাবছি কি করা যায়? এমন সময় একজন মহিলা লম্বা ছিপছিপে শ্যামলা, উনি এসে ঢুকলেন ঘরে। এ মহিলা আমার চাইতে ২ বৎসরের সিনিয়র শোভাদি। তো সেই শোভাদি আবার এখানকার এডুকেশন এ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর অর ডেপুটি ডিরেক্টর কিছু আছেন। তো শোভাদি আমাদের দেখে ভীষণ খুশী হয়ে গেছে। তিনি বললেন, আমি রোজ দেখতে আসি পরিচিত কেউ আসছে কিনা? কারণ আমার নিজের বাড়ী ঢাকাতে। আর আমি রোজ আসি খোঁজ করতে। আজকে আমি তোদেরকে পেলাম। তোরা এসেছিস খুব ভালই করেছিস বলে উনি বললেন, এক কাজ কর তোরা দুইজন এখানে থাক। আর বাচ্চাগুলোকে আমি নিয়ে যাই। বলে উনি ৪টা বাচ্চাকে নিজে নিয়ে গেলেন। উনি কিন্তু আনম্যারিড বিয়ে করেননি। তো উনার হাতে বাচ্চাগুলোকে দিয়ে দিলাম নিরাপদে।

আর আমরা দুইজন এখানে থাকলাম। এরপর উনি আবার আমাদেরকেও নিয়ে গেলেন চলে আয় এখানে। ওখানে কিছুদিন থাকার পর আমি বললাম শোভাদি ছেলেমেয়ে তোমার কাছে আছে থাক। আমি আর উনি আবার কলকাতায় যাই। গিয়ে দেখি, শুনছি যে কলকাতায় সরকার গঠন করেছে। কি হয়েছে, কি হচ্ছে একটু, আমরা বুঝি। তা যা, উনি আবার একটা ব্যবস্থা ট্যাবস্থা করে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন। কলকাতায় গিয়ে তখনকার সরকারের সাথে দেখা হলো, যোগাযোগ করলাম। তো থাক এখানে আজকে। এরপর স্বাধীনতার অন্য কাহিনীতে চলে আসব।

এভাবে তিনি এত পরিস্কার করে কথাগুলো বলে গেলেন মনে হয়েছে একদম ছবির মত।

তারপর তিনি তাঁর বিশেষ কর্মকান্ড সম্পর্কে জানালেন যা অতি রোমাঞ্চকরঃ

বিশেষ কিছু বলতে গেলে ১৯৫০ এর গোড়ার দিকে আমি রাজনীতিতে যুক্ত হই। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, পূর্ববাংলার আইন পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে আইন পরিষদ সচিব (পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি) হিসাবে কাজ করি।

আমরা ঢাকা থেকে বের হয়ে কত কিছু করে কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া আগরতলা গিয়েছিলাম তাতো বলেছি। আমাকে কিছু করতে হবে আমার একটা দায়িত্ব আছে। মুজিব নগর সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে ভারতীয় লোকসভার যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিলাম। কেমন করে যে দিলাম জানিনা, এক ঘন্টাধরে বক্তৃতা দিয়েছিলাম। আমার বক্তৃতার পর অনেক সদস্যের দ্বিধা-দন্দ্ব দূর হয়ে গিয়েছিলো। যাঁরা ঘটনাটি জানতেন না তাঁরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন।

এই ভাষণ দিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার আহবান জানানোর দায়ে পাকিস্তানের সামরিকজান্তা আমাকে নিরুদ্দেশ অবস্থাতেই ১৪ বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করেছিলো। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে আমাকে আবার স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রির দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো।

আন্দোলনের বাইরে তাঁর জীবনের বিশেষ নাটকীয় কিছু দিক নিয়ে তিনি বললেনঃ

অল ইন্ডিয়া রেডিওর ইন্টারভিউতে বলেছিল চাকরীটা হলে আমি কোন ষ্টেশনে কাজ করতে চাই। আমি বলেছিলাম ঢাকা ছাড়া অন্য যেকোন ষ্টেশনে। আথচ সেই ঢাকাতেই আমাকে এসে কত কিছু করতে হলো। চাকরী, রাজনীতি ছাড়াও আরও কতকিছু। একসময় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হলাম। ডক্টরস ক্লাবের মঞ্চে শরৎচন্দ্রের ''বিজয়িনী" নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করলাম, সেখানে মুনীর চৌধুরীও অভিনয় করেছিলেন। তখনকার পরিবেশটা এখন কল্পনাও করা যায় না। তখন ঢাকায় সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা ঘোরার গাড়িতে পর্দা ঘেরাও করে বাইরে বেরুতো। সেই ঢাকায় একজন মহিলা নাটক করছে প্রকাশ্য মঞ্চে পুরুষের সাথে সেটা অভাবনীয়। কারণ তখনও পুরুষরা মহিলা চরিত্রে অভিনয় করতো মহিলা সেজে। তারপর আরো অন্য নাটকেও অভিনয় করেছি। ''এদেশ একাল" নামক একটি মাসিক পত্রিকায় সম্পাদনার কাজ করেছি, কাজ করেছি শিক্ষক হিসাবে তা আগেই বলেছি। অল ইন্ডিয়া রেডিওতে ঘোষিকা হিসাবে কাজ করেছি।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রথম সভাপতি আমি এছাড়াও আমি আজিমপুর লেডিস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা।

ধন্যবাদ আপনাদেরকে! আমি খুব খুশী যে, আপনারা কষ্ট করে আমার এখানে আসছেন এবং আমি এটাকে বেশ আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করছি! তবে আমার কথাগুলো নিয়ে আমি খুব বেশী খুশী না। কারণ এখন আর গুছিয়ে তো তেমন কথা বলতেও পারিনা!

এভাবেই এমন বিনীত ভাষায় তাঁর কাছ থেকে সেদিনের মত এবং শেষ বারের মত শোনা হলো। আমরা জানতাম না ওটা যে শেষবার হবে। তাঁর কাছ থেকে আমাদের আরোও জানার কথা ছিলো। তিনি আমাদের কী উপদেশ দিতে চান, তাঁর সাম্প্রতিক ভাবনাগুলো কী ইত্যাদি বিষয়ে। তা আর হলো না!

২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এক তারিখে বিচিত্র গুণের অধিকারী এ নারীর জীবনাবসান হলো। তাঁর প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর বিদেহী আত্মা শান্তিতে থাকুক এ প্রত্যাশা।